দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে

তণ সান্যাল

তখন আমার ছ - সাত বছর বয়স। সেই বালকবেলা। বর্ধমান শহর অর্থাৎ শুকনো রাঢ়ভূমি থেকে এসেছি উত্তর বাংলার পাবনা জেলাপলিমাটির ভুবনে। জলস্ফীত নদী, গ্রামের ভিতরের খালে খালে ভরা যৌবন, গ্রামের আম, জাম, কড়ুই, কদম গাছগুলি ঘন সবুজ মাথা নামিয়ে ধরেছে সেই খালের উপর, যেখানে চলেছে পানসী কোষাকুষি নৌকা, নদীতে বুকটান করে চলেছে ভেদীনৌকা, ভেসাল, বজরা। আমাদের বাড়ি থেকে ধান পাটের সবুজ মাথা ছাড়িয়ে একটি গ্রাম দেখা যেত। মহারাজপুর। আমাদের পোরজনা গ্রামটি ছিল নিছকই হিন্দু প্রধান। মহারাজপুরে ছিল পুরোটাই মুসলিম জনবসতি। একসময় বর্ষার জল নামল। ধান পাট কাটা হয়ে গেল সেই মাঠে খেসারি, মটর, সর্ষে বোনা হলো। সেই ছেলেবেলায় সদ্য জল থেকে জেগে ওঠা গ্রামের রাস্তা আঁকাবাঁকাভাবে দেখলাম চলে গেছে মহারাজপুর পেরিয়ে হয়ত কোন অজান ার দিকে। সে সময় আমার জসীমউদ্‌দীন -এর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। কবিতাটি বহু পঠিত, জসীমউদ্‌দীনের রাখালী কাব্যগ্রন্থের 'রাখাল ছেলে'। কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে মনে হতো মহারাজপুরের ওদিকে কোথাও সোনার পাতায় ছাওয়া ছোট্ট কুটির আছে। আর প্রভাত হলেই মিঠেলি হাওয়া রাখাল ছেলের সঙ্গে খেলা করে, মাঠে সবুজ রঙের চেলি নিয়ে দেয়। যেখানে লাঙল চষতে রাখাল ছেলে মুর্শিদা গান জোড়ে। তখন আমি জসীমউদ্‌দীনের কোন কবিতার বই পড়িনি। কিন্তু নানা পাঠ্যবই -এর ভিতর দিয়েই তাঁকে চেনা, বিশেষ করে পল্লীজননী, কবর, তণ কিশোর বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায় এই ধরনের সব কবিতা পড়ে পড়ে। আর তেমনি ছিল আববাস আলীর গলায় গান, পরে যা জেনে ছিলাম জসীমউদ্‌দীনের লেখা। যেমন --- 'ও বাজনা, চল্ যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে' কিংবা 'বাঁশরী অমার হারায়ে গিয়াছে য াবার বেদনা। এমনি করে এক সময় পড়লাম 'রাখালী' ও নক্সীকাঁথার মাঠ', 'ধানখেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'সোজন ব াদিয়ার ঘাট', 'হাসু'। অন্য সব কবিতার বই এর মধ্যে 'মাটির কান্না' তো কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের। যে বইটিতে জসীমউদ্‌দীন গ্রাম ছেড়ে শহরে পা দিতে গিয়ে হয়ত তার কিছুটা স্বভাব হারিয়েছিলেন।

আমার কবি হয়ে ওঠার পিছনে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, নজল এবং ত্রিশ - এর ও চল্লিশের রথী - মহারথীদের কাছে শিক্ষা নেওয়া তো ছিলই, কিন্তু জসীমউদ্‌দীন আমাকে গ্রাম দেখার চক্ষু দান করেছিলেন। ১৯৭৬ সালে শেষবারের মতো যখন জসীমউদ্‌দীন কলকাতা আসেন রবীন্দ্রসদনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার অনুষ্ঠানে আমাকে মিনিট দশের জন্য বলার সুযোগ দেওয়া হয় জসীমউদ্‌দীনের উপর, তাঁরই উপস্থিতিতে। ভালমন্দ যাই বলি না কেন, আমি তো গৌরবান্বিত হলাম। জসীমউদ্‌দীনও খুব খুশি হয়েছিলেন।

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৪ সালে বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলায় তাম্বুলখানা গ্রামে। শিক্ষা ফরিদপুর ও কলকাতা। তঁ ার আই, এ. পড়বার সময়ে 'কল্লোল' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় 'কবর' কবিতাটি। কবিতাটি পড়ে বিগলিত হয়েছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এবং তিনি তখনই ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন কবিতাটি। এইভ াবে প্রকাশ মাত্রই খ্যাতি খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটেছে। একসময় দীনেশচন্দ্রই গ্রামীণ গাথা সংগ্রাহক জসীমউদ্‌দীনের কবিতার খাতা পড়তে অস্বীকার করেছিলেন।

নজল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯, জীবনানন্দ দাশেরও। তাই বলা যায় জসীমউদ্‌দীন এই দু'জন কবির খুব কাছাকাছি সময়

জন্মেছেন। নজল ইসলামের সঙ্গে তাঁর এক বিষয়ে মিল ছিল। লোক কবিতা, লোক - গান, লোকগীতি, পুঁথি, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়।

নজল বালক বয়সে লেটোর দলে গান বেঁধেছেন। দুখু মিঞা (নজলের ডাক নাম) -কে লেটোর দলের প্রধান গান বাঁধিয়ে'গোদা - কবি' বলতেন 'ব্যাঙাচি'। ভবিষ্যৎবাণী ছিল সেই গোদা কবির, 'ব্যাঙাচি' একদিন জাত সাপ হবে।' নজল তা হয়েও ছিলেন তবে নজল মুখ্যত নাগরিক কবি ছিলেন। বা বলা যায় বিশ - ত্রিশ সালে নগর - জীবন থেকে উদ্ভুত পরিশীলিত মানুষের সুখ - দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, দেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাঁর কাব্যের ছন্দ মুখ্যত অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। স্বরবৃত্ত খুবই কম। অন্যদিকে জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন অধিকাংশ কবিতা মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে। ছন্দের বিচারে এ দু'জন কবির সাধারণ ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু নজল অনেক বেশি নাগরিক বলে অক্ষরবৃত্তকে বলা হয় ব্রাহ্মণ ছন্দ বা অনেক বেশি নাগরিক বা শিষ্ট রচনার ছন্দ। স্বরবৃত্তকে বলা হয় ব্রাহ্মণ ছন্দ বা অনেক বেশি নাগরিক বা শিষ্ট রচনার ছন্দ। স্বরবৃত্তকে বলা হতো শূদ্র ছন্দ। যাতে ছেলে ভুলানো ছড়া, লোককাহিনী, ব্রতকথা, রূপকথার নানা অঙ্গ ইত্যাদি লোককবি ও মেয়েরা রচনা করতেন। যদি গট্‌ফ্রিড হার্ডারের কথা মানতে হয় তবে ধরে নিতেই হবে যে গণতান্ত্রিক জগতেও শিষ্ট সাহিত্যের ভিত্তিতে আছে লোকসাহিত্য। ইয়ুং - এর মতে লোকসাহিত্যের বা লোকশিল্পের সৃজনলীলার শিকড় থাকে যৌথ নির্জ্ঞানের ভুবনে। এবং প্রত্যেক জাতির নির্জ্ঞানে আছে বহু প্রা আকার প্রতীক বা আর্কিটাইপ। এই আর্কিটাইপের শিরদাঁড়ার উপরে রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে ওঠে নতুন চরিত্র বা নানা চরিত্রের চেনা মুখাবয়ব। যে মুহূর্তে কোনও কবিতা বা গান আমাদের মনের গভীরে ঘুমন্ত আর্কিটাইপ জাগিয়ে তোলে, আমাদের অজান্তেই সেই শিল্পকর্ম মনে ধরে যায়। আমরা যেমন কোনও সুর শুনলে বলি এটি নিছকই বাঙালি সুর। তার আদত কারণ আমাদের ভিতরের যৌথ নির্জ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে ব্যাপ্তিকে সুরের আকারটি ছুঁয়ে যায় বলে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই সৌন্দর্যবোধ সুখ - দুঃখ, আনন্দ - বেদনা ঐ প্রত্ন প্রতীককেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। জসীমউদ্‌দীনের জয় ঐ প্রত্ন প্রতীকগুলিকেই জাগিয়ে দেওয়া। ফলে 'নক্‌সী - কাঁথার মাঠ'পড়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন আবেগ আপ্লুত হয়ে লিখেছিলেন, সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম। সেই পল্লীর মাঠঘাট এ যেন কত চেনা হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দু'টো ডাগর চোখ, পল্লী রাখালের চোখ জুড়ানো কালো রূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি, বাঙ্গালির বিবাহ বাসর, গিন্নির ঘরকন্না, এইসব দৃশ্য বুকে জুড়াইয়া গেল। এই পল্লীদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল। এখনও হয়ত কিছু আছে; কিন্তু এইসকল হারাইয়া ফেলিয়া ছিলাম। এই হারানো জিনিস নূতন করিয়া পাওয়ার যেআনন্দ কবি জসীমউদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন।" অর্থাৎ আচার্য সেন তাঁর মনের ভেতরে গভীরে প্রোথিত একটি জাতির যৌথ নির্জ্ঞানের মধ্যে ঘুমন্ত যে আকর বা প্রত্ন প্রতিমা ছিল অভিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়।

জসীমউদ্‌দীন -এর গুত্বপূর্ণ কবিতা 'কবর' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'কল্লোল' ছিল আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করার পত্রিকা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমী সাহিত্যে খাড়াখাড়ি দুই আধুনিকতার ধারা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। শবিপ্লবের পর এইদুটি ধারা আমাদের দেশে তণ লেখকদের মধ্যে এক আশ্চর্য আন্তঃভেদ (ইন্টার পেনিট্রেশন) ঘটায়। অন্তরঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে ফ্রয়েড ও হামসুন। বহিরঙ্গে এসে পৌঁছন মার্কস ও ম্যাক্সিম গোর্কি। বাঙালি আধুনিক সাহিত্যে কেউ এলিয়টের মতো মধ্যযুগীয় ক্যাথলিকবাদ - এর পুনর্বাসন চাননি। কি মধ্যযুগীয় হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের। বরং বাঙালি আধুনিকতা গোড়াতেই অনেক বেশি সেকুলার। উপরন্তু ভারতীয় ও বাঙালি ভিন্নতর ঐতিহ্য সাধনার দিকে ঝুঁকে, পড়েছিল এই শতকের সূত্রপাতেই। সে অনুসন্ধান অজন্তার ফ্রেসকোর বনীকরণের নবীনায়নে, বাঙালি লোকযান আবিষ্কারের পথে। বাঙালি লোকভুবন আবিষ্কাকর করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও কম ছিল না।

এই আত্ম - আবিষ্কারের পথেই স্বদেশী আন্দোলনে জসীমউদ্‌দীন যাতে সাময়িকভাবে হলেও স্বেচ্ছাসেবী হয়েছিলেন। স্কুলেরগণ্ডী পার হতে না হতেই নজল ইসলাম স্বদেশ মুক্তির তাড়নাতেই এক সময় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। একজনের মাথায় ছিল অহিংস গণ আন্দোলন, (জসীমউদ্‌দীন) আর একজন ছিলেন বিপ্লববাদে বিশ্বাসী। জসীমউদ্‌দীন নজল ইসলামের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছর কনিষ্ঠ। নজল ইসলামকে এক সময় তিনি বালক বয়সে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর কিছু কবিতা ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য।

মোজাম্মেলস হকের উপদেশ মতো 'বঙ্গীয় মুসলীম সাহিত্য - সমিতি'র অফিসে নজলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি এবং

কবিতাগুলি দেখান। তখনও নজলের কাছে জসীমউদ্‌দীন ছিলেন শিশু কবি। কিন্তু স্কুলের গণ্ডী পেরোতে না পেরোতেই তিনি তখন রাজনীতিতে ভিড়ে পড়েছিলেন। এবং কারো কারো মতে সমাজসেবক সমিতি প্রভৃতির সাথে জসীমউদ্‌দীন স ম্পর্কিত হন আদতেনজলের সাহচর্যকেই কামনা করে। প্রখর স্মরণশক্তি ছিল জসীমউদ্‌দীনের। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট প াঠত্রমের বাইরে বই পড়া ও কবিতা আবৃত্তি করাও ছিল সে সময়ে তাঁর নেশা। বাবা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, তাঁর কিছু দোভাষী পুঁথি ও পাঠ্য বই ছিল। সহপাঠীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছোটদের পড়বার মত অনেক বইও ছিল, সাত অ াট বছর বয়সে কবিগান তাঁকে আকৃষ্ট করে। কাছাকাছি যেখানেই কবিগান হতো সে সব আসরে গিয়ে তিনি বসতেন। এবং নানা সুরের ধুয়ার সঙ্গে পদ যোজনা করে ছড়া রচনাও করতেন। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের কাছে জসীমউদ্‌দীনের ঋণের কথা অস্বীকার করা যায় না এবং তা করেনওনি। ক্লাসের সহপাঠি বন্ধুরা তাঁর কবিতা পড়ে খুব অব াক না হলেও এবং কখনো কখনো বিদ্রূপ জানালেও ক্ষীরোদবাবু তাঁর কবিতার যথেষ্ট তারিফ করতেন। ক্ষীরোদবাবু ছিলেন ফরিদপুরের ঈষাণ স্কুলের শিক্ষক। তিনি কবিও ছিলেন।

জসীমউদ্‌দীন যখন নবম শ্রেণীতে পড়েন তখন কিছুদিন Education can wait Swaraj cannot wait-এর যুগে প্রাতিষ্ঠা নিক শিক্ষার গোলমখানাও ছেড়েছিলেন। কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় ‘দৈনিক নায়ক’ পত্রিকা বিত্রি করতেন। মোজাম্মেল হক - এর অনুপ্রেরণায় জসীমউদ্‌দীনের কিছু কবিতা ‘মোসলেম ভারত’, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ‘সাধনা’ প্রভৃতি পত্রিকায় ছ াপা হয়। ১৯২১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এ সময় তখনকার দিনের সবচেয়ে বুদ্ধিবাদী পত্রিকা প্রব াসীতে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। মোসলেম ভারতে’র যে সংখ্যায় নজলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও জসীমউদ্‌দীনের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এসব সত্ত্বেও জসীমউদ্‌দীনের আসল ঝোঁক ছিল গ্রাম্য কবিতা ও গ ান সংগ্রহের দিকে।সেই কবিগান শোনার যুগ থেকে সু করে অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কিছু গ্রামীন গাথা গান, ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ভারতীতে জসীমউদ্‌দীনের ও মনসুদ্দীনের পল্লীগান একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতেও এ দু’জনেরই সংগৃহীত বাউল গান প্রকাশিত হয়। কলক াতায় পৌঁছে অবশ্য রাজনীতিতে ডুবে থাকা নজলের কাছে খুব আমল না পাওয়ার ক্ষুব্ধ জসীমউদ্‌দীন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন - এর সঙ্গে পরিচিত হন। দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রাম্য গান সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন। মুগ্ধ দীনেশচন্দ্র তাঁকে সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ের গ্রাম্য গাথার সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ করেন। জসীমউদ্‌দীনের এই নতুন নিয়োগ তাঁর প্রতিভার পথ অর্গলমুক্ত করে দেয়। ঐ সময়েতিনি ‘কল্লোলে’র সঙ্গে সম্পর্কিত হন। শোনা যায় দীনেশচন্দ্র প্রথমে জসীমউদ্‌দীনের কবিতার খাতাটি দেখতে অস্বীকার করেন। কিন্তু দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় যে ‘কবর’ কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সে কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হন। এবং ফরওয়ার্ড পত্রিকায় অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ‘তিলক’ সংখ্যাটিতে দীনেশচন্দ্র ঐ ‘কবর’ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, ‘a Mohammedan Poet’ বলে একটি জসীমউদ্‌দীনের ওপরে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। জসীমউদ্‌দীন প্রায় রাতারাতি বাঙালি জ্যোতির্বলয়ে অন্যতম ত ারকা হয়ে গেলেন।

যদিও দীনেশচন্দ্র সেন ‘A Mohammedan Poet’ বলে উল্লেখ করেছেন জসীমউদ্‌দীনকে, কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের সমস াময়িক কবি কালিদাস রায় তাঁকে একান্ত বাঙালি কবি বলেই মূল্যায়ন করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের সমসাময়িক আরও কয়েকজন রবীন্দ্রানুসারী কবি গ্রাম্যজীবন নিয়ে কবিতা লিখেছেন। যেমন কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, কণানিধান বন্দ্যোপ াধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তুলে ধরেছেন তাঁর অজয় নদীর পাড়ের গ্র াম কোগ্রামের কথা। কণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কম লিখেও শান্তিপুর অঞ্চলের ছবি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। কালিদাস র ায় - এর কবিতায় ছিল ঐতিহ্য ও বৈষ্ণব চিন্তা। এঁদের কবিতা ও আধুনিক কবিদের রচনার সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের তফাত ছিল। গ্রাম বাংলার ছবি এঁদের কবিতায় যা এসেছে তা কুমুদরঞ্জন বাদ দিলে, সেগুলিতে বেশ শহুরে শফিস্টিকেশন আছে। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘কাজলা দিদি’ বা ‘অন্ধ বধূ’ এখনও মনে সাড়া জাগিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও বলতে হয়কালিদাস রায় এর ভাষায় “... যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে। শ্রীমান্ জসীমউদ্‌দীন তাহাকে বাঙালির চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সে হিসাবেও কবিতাগুলি অভিনব।” কালিদাস রায় জসীমউদ্‌দীনের কাব্যঅঞ্চল পুরো নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গই ধরেছেন ঃ “বঙ্গ সাহিত্যে ত্ত্বব্দব্ধস্তব্জপ্ত ত্রস্কব্দব্ধ

লেখার জন্য কবি কুমুদরঞ্জনের খ্যাতি আছে। কবি কুমুদরঞ্জন রাঢ় দেশের লোক। রাঢ় দেশের রীতি - প্রকৃতি ও পল্লী জীবনটি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বেশ ফুটিয়াছে। জসীমউদ্‌দীন ও ত্ত্বব্দব্দপ্সজ্জ্রপ্ত ত্নপ্সন্দব্ধপ্পব্দ লিখেছেন -- রাখালিয়া সুরে। পুস্তকের নাম 'রাখালী'। জসীমউদ্‌দীন যে দেশের পল্লী প্রকৃতির আবহাওয়া ও পল্লী সমাজে বাল্য কৈশোর যাপন করিয়াছেন, সে দেশে ভৌগোলিক হিসাবে বাংলাদেশ হইলেও রাঢ় দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেবমাতৃক রাঢ় দেশের নরনারীর জীবন ও প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য পূর্ববঙ্গ হইতে রীতিমত বিভিন্ন। জসীমউদ্‌দীনের রাখালিয়া গান পূর্ববঙ্গের নদীর চরা হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাই ইহা বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব সম্পদ

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকৃতি অন্তত পক্ষে কিছু স্মরণযোগ্য পংক্তি যে নির্মাণ করেছে এতে কোন সংশয় নেই। উপরন্তু তাঁর গাথা কাব্যগুলি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গীয় সাবালটার্ন গ্রাম জীবনের ঋিস্ত ছবি ও সম্পত্তির সম্পর্ক পাওয়া সম্ভব। মানুষের জীবনে বড় তিন বিযুক্তি -- মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ এবং মানুষ ও তার অন্তরতম সত্তার সঙ্গে ধরা পড়ে। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিযুক্তি তেমন কোন শিল্পের জন্ম দেয় নি। বরং প্রপঞ্চ প্রকৃতি ও এলিমেন্টাল মানুষ, এই দুই বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তি বা যৌথ গ্রামের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর অধিকাংশ কবিতা রূপ পেয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের পাঠক কিন্তু গ্রামীণ চাষাভূষো নন। বরং শহরের শিক্ষিত বাঙালি, যার কাছে পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম জীবন ও প্রকৃতি নস্টালজিক আবেগ সৃষ্টি করে। আধুনিক কবিরা বৃহৎ লোকসাধারণ্যের কাছে পৌঁছবার বাসনা রাখেন না, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পুঁজিবাদের দাক্ষিণ্যে অজস্র খণ্ডিত অংশে শ্রম বিভাজনের ফলে ব্যক্তির যে পন্যের উপর ভিত্তি করে বিযুক্তি ঘটে, তারই প্রতিফলন রয়েছে আধুনিক কবিতাতে। পরন্তু ঐ বিযুক্তি জসীমউদ্‌দীনে অনুপস্থিত। তিনি যখন 'মাটির কান্না' লিখেছেন তার অধিকাংশ কবিতা না হয়েছে আধুনিক না হয়েছে গ্রামীণ গাথা, বরং গ্রামীন গাথার ঢঙে শহুরে বোধ ধরতে চেয়েছিলেন তিনি তখন। কার্যত তিনি 'যোবন মথুরা'র সেই' তণ কিশোর' যাকে বলা যেতে পারে---

ঘরে ফিরে যাও সোনার কিশোর। এ পাপ মথুরাপুরী,
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবান ছুঁড়ি ছুঁড়ি!
তবুও, মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই! কালের রজ্জু ধরে,
তণ কিশোর! কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি বয়ে যায় অবিরল। (তণ কিশোর)

জসীমউদ্‌দীনকে পৃথিবীর নানা দেশে লোকজীবনকে শিষ্ট সাহিত্যের উপকরণ গড়ে তোলার আন্দোলনে অন্যতম অংশীদার বলা যেতে পারে। মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট কিংবা স্কটিশ কবি ম্যাকডিযার মন্টকে মনে পড়িয়ে দেয়। শ বিপ্লবের পর প্রতিটি প্রান্ত অধিজাতির তো বটেই শ সাহিত্যেও গাথা কাব্যের উদ্বোধন হতে থাকে। শ কবি তিখনোভ, দাঘেস্তানী কবি রসুল গামজাত,তাজিক কবি মীর্জা তুরসুন জাদা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন লোকজীবনকে গণজীবণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। লোকজীবনে থাকে রাজনীতি পরিপ্রেক্ষিতহীন গ্রামজীবনের একধরনের আবহমানতার আলেখ্য। ধাঁধা, ছড়া, লোক - কাহিনী, গাথা, কিস্যা প্রভৃতিতে তাপ পায়। কবিতায় তা গেয়ও। লোকগীতি ও লোককথা, দৈবকাহিনী ও কোনও না কোনও অব্যাখ্যাত রহস্য ব্যাখ্যারও তা সমাধান খোঁজে। কিন্তু লোকসাহিত্য যখন গণসাহিত্যে রূপান্তর পায়, তখন স্পষ্ট ও সচেতন বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী লোকঘরানাকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। লোকসাহিত্যে মূল বিযুক্তি মানুষ ও প্রকৃতি। গণসাহিত্যে মূল বিযুক্তি মানুষ ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ইউক্রেনীয় কবি তারাশ শেভচেংকো তাঁর কাতেরিনা বাদাল বা গাথাকাব্যে প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি তণীর বিযুক্তি তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ, জসীমউদ্‌দীনের সম্মানিত পূর্বসুরী ও সমসাময়িক বহু কবি আমাদের নজরে পড়ে এদেশে সেদেশে

আমরা যা ছেলেবেলায় কবিতার কাছাকাছি এসেছিলাম, তাদের কাছে সত্যি বলতে কি সুকুমার রায় এর তুলনায় জসীমউদ্‌দীন আর কিশোর বেলায় নাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজল, সুকুমার রায়। সুকুমার রায় অত্যন্ত সচেতন সমাজমনস্ক কবি। উদ্ভটও তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন। আধুনিক কবিতায় সমাজমনস্ক সমালোচনামূলক বাস্তবতা তাঁর কবিতায় অ্যাবসার্ডএর মধ্য দিয়ে রূপ নিয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত মত যে, লোকমহিমার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের যোগাযোগ

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঙালি বালক - বালিকা, কিশোর - কিশোরীর কাছে জসীমউদ্‌দীন অবশ্যই পাঠ্য হওয়া উচিত। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে' যেমন রূপাই-এর প্রেম ও সাজুর প্রতীক্ষা এক আশ্চার্য লোকমহিমার সৃজন ঘটিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কার ইত্যাদির চিত্র সেখানে আছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' মুসলমান যুবক ও হিন্দু নমঃশূদ্র নারীর প্রণয়ের ভিতর দিয়ে এক ট্রাজেডির প্রকাশ আমাদের মনকে আতুর করে তোলে। মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে শব্দবাহিত চিত্ররূপ যে আশর্চ্য ভূমিকা পাল করে থাকে জসীমউদ্‌দীনের কাছে যে কোনও কবি সে শিক্ষা নিতে পারেন। বলাবাহুল্য বহু জাতীয় স্মৃতি ঐ চিত্রকল্পগুলিকে বাহন করে এসেছে। 'Residual of racial experiences stirred in the unconscious depths of the mind.'

তাঁর শেষদিকের কবিতাগুলির ভিতরে রয়েছে 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে'। কবিতাগুলি শুধু বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, পাকিস্তানি দস্যুদের হাতে ঐতিহ্য বিজড়িত ধামরাই রথটি পুড়িয়ে দেওয়া তাঁর ধিক্কারের অঙ্গ হয়েছে। আর বাবরি মসজিদ বাঙার ফলে ভারত ও বাংলাদেশে কত গীতা কত আফরোজা কলুষ হাতের পীড়নে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সে বেদনা কবির সঙ্গে আমরাও মনে রাখি। একসময় জসীমউদ্‌দীন নিজেকেই অনুকরণ করেছিলেন। ঝলসে উঠেছিলেন তিনি শেষব ার যখন 'গীতারা কোথায় গেল' মতো কবিতা আমরা আবার তাঁর কাছে পেয়েছিলাম।

গীতারা কোথায় গেল,
আহা সেই পুতুলের মতো রাঙা টুকটুকে মেয়ে!
দেখলে তাহাদের মায়া মমতার ধারা বয়ে যায়
সারা বুকখানি ছেয়ে,
আদরি তাহারে কথা না ফুরায়ে
কথার কুসুম আকাশে বাতাসে উঠে বেয়ে,
দেখলে তাহারে ছড়ায় ছড়ায় যে মন
গড়ায় ধরণী ছেয়ে

ওদের গ্রামের চারিদিক বেড়ি ঘিরেছে দস্যুদল,
ঘরে ঘরে তারা আগুণ জ্বালায়ে পুকারে অগ্নিকল।
সেই কটি মেয়ে কোলে তুলে নিতে কোল যে জুড়িয়ে যেত,
কে মারিল তারে? মানুষ কি পারে নিষ্ঠুর হতে এত!
অফুট কুসুম কে দলেছে পায়ে? কথারসে বুলবুলি
কোন নিষ্ঠুর বধেছে তাহারে গলায় আঙ্গুল তুলি?

সে বন - হরিনী নিষ্ঠুর হাত হতে পালাবার লাগি
হেথায় হোথায় কত না ঘুরছে হায়!
সারা গাঁও করি উথাল পাথাল বাণ - বিদ্ধ যে করিয়াছে ব্যাধ তায়।
আহারের আমার ছোট গীতামণি,
তোর তরে আজ কেঁদে ফিরি সবখানে,
মোর ক্রন্দন নিষ্ঠুর দেশের সীমানা পেরিয়ে
পারিবে কি যেতে কোন দরদীর কানে। ('ভয়াবহ সে দিনগুলি')

গীতা নামটির বদলে স্বচ্ছন্দে আমিনা, আফরোজা বা যেকোন মুসলিম বালিকার নাম দেওয়া যায় না ভারতেও যখন সা ম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com